ব্রু । না । ই

নকলের ভিড়ে

নকলের ভিড়ে জাতি আসল-নকলও চিনতে পারে না...

লিখেছেন **মির্জা জাকির**

ব্রুনাইতে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রবাস যাপন করতে গিয়ে আমাদের বাংলাদেশীদের বিচিত্র কলাকৌশলের কাছে ঘুষ, দুর্নীতি ও অপরাধমুক্ত এদেশীয় পুলিশসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের হার মানতে দেখেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের আসলকে নকল হিসেবে সন্দেহের দৃষ্টিতে পড়তে দেখেছি। ব্রুনাইয়ে নিজস্ব গাড়ি ছাড়া জীবনযাপন প্রায় অচল বললেই চলে। তাছাড়া জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানে রিকন্ডিশন গাড়ি স্বল্পমূল্যে কেনাও একেবারে সহজ। রোড ট্যাক্স কিংবা চালকের লাইসেন্স এসবের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মতো অসাধু ও ভিন্ন পথে কিংবা আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্য এদেশে নেই। সবার ক্ষেত্রে আইন সমানভাবে প্রযোজ্য। বিদেশীদের ক্ষেত্রে স্বদেশীয় লাইসেন্স দেখাতে হবে। যান চলাচল দপ্তরে গিয়ে ইন্টারভিউ দিতে হবে। তারপরই পাওয়া যাবে এদেশীয় লাইসেন্স। তাই তো আমাদের দেশের অধিকাংশই এদেশে এসে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে অতি সহজে ড্রাইভিং শিখে ফেলে এবং গাড়ি কিনে নেয়। দু'চারজন পেশাদার ড্রাইভার কিংবা লদাচিৎ দু'একজন ছাড়া অন্যরা কেউ কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ড্রাইভিং শিখে আসেনি। এ দেশীয় লাইসেন্স পেতে আমাদের দেশের লাইসেন্স দেখাতে হয় বলে বাংলাদেশীয় অনেকেই তাই বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সাধু (!) ব্যক্তিদের মাধ্যমে ভিন্ন উপায়ে লাইসেন্স সংগ্রহ করে আনে। আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের লাইসেন্সগুলো এককেটা একেক রকম।

আমাদের দেশীয় নকল লাইসেন্সগুলোর ভিড়ে আসল লাইসেন্স অনেক সময় এদেশীয় কর্তাব্যক্তিদের কাছে সন্দেহের সৃষ্টি করে। আর তাই আসল প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় এরা আমাদের দেশীয় স্থানীয় দূতাবাসে পাঠান সত্যায়িত করে আনার জন্য। দূতাবাস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ক'জনেরই লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়ে সম্যক ধারণা রয়েছে তা নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। সেখানে দূতাবাস কর্মকর্তা আসল প্রমাণ করতে তা প্রেরণ করেন বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। আর সে দপ্তর থেকে প্রতিউত্তর যে কবে মিলবে তার নিশ্চয়তা মেলে না। হয়তো মাসের পর মাস তা সেখানে ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। আমার এক বন্ধু দেশ থেকে ড্রাইভিং শিখে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে লাইসেন্সের রাজস্ব ফি দিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সঠিক পথে একটি লাইসেন্স সংগ্রহ করে এদেশে আসার সময় নিয়ে আসে। এদেশে গাড়ি কিনে এদেশীয় লাইসেন্সের জন্য আবেদন করলে বাংলাদেশের লাইসেন্সটি এদেশীয় ঐ দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে সন্দেহ সৃষ্টি করে। লাইসেন্স অথরিটি তা বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে সত্যায়িত করে আনার জন্য বললে সে বন্ধুটি তা সত্যায়িত করতে দ্বারস্থ হন স্থানীয় দূতাবাস কর্মকর্তার। সম্প্রতি দেশে বদলি হয়ে যাওয়া ঐ কর্মকর্তা বেশ ক'মাস আগে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লাইসেন্স ইস্যু সঠিক কিনা তা যাচাইয়ের জন্য পাঠালেন। আজো তার কোনো প্রতিউত্তর মেলেনি। এভাবে দূতাবাসে এসে প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে এবং আমাদের দূতাবাসের ও দেশীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের এই তেলেসমাতি কর্মকান্ডে এক সময় হতাশ হয়ে অবশেষে আমার সেই বন্ধুটি গাড়িটি অন্যত্র বিক্রি করে দেন। তার গাড়ি চালানোর শখ মিটে যায়। লাইসেন্স না থাকায় কাঙ্ক্ষিত ভালো বেতনের সুন্দর একটা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়। অবশেষে এক সময় সে দেশে পাড়ি জমায়। বাংলাদেশের সর্বত্র নকলের মহোৎসবে আসল জিনিস বড় বেমানান, তা এই ব্রুনাইয়ের কর্তাব্যক্তিদের চোখে ধুলোও দিতে পারে, তার প্রমাণ আমার সেই বন্ধুর সঠিক পথে আনা ড্রাইভিং লাইসেন্সটি।

সু । গা । মো

বাংলাদেশের মেয়েরাও পারে

বিরল সম্মানে ভূষিত হয়েছে বাংলাদেশের এ মেয়েটি

বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের সাথে কৃতি ছাত্রী তুলি

সম্প্রতি জাপানের মতো একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দেশে বাংলাদেশী এক ছাত্রীর অভূতপূর্ব সাফল্য অনেককেই তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অবিশ্বাস্য এ সাফল্যে জাপানস্থ অনেক বাঙালিই কিছুটা হলেও নিজেদের জাতিসত্তার গরবে বিমুগ্ধ হয়েছে। তুলি নামের এই মেয়েটি অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রতিযোগিতা করে জাপানি ভাষা ইনস্টিটিউট থেকে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। সেই সঙ্গে পেয়েছে সম্মানী।

সদালাপী, ধর্মভীরু ও অতিবিনয়ী এই বাঙালি মেয়েটির মুখে সেদিন যেন খই ফুটেছিল। কানাডা, চীন, ভারত, রাশিয়া, কোরিয়া, মালয়শিয়া, তাইওয়ান, অস্ট্রেলিয়া, মায়ানমার ও পাকিস্তানসহ অনেকগুলো দেশের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এ প্রতিযোগিতা হয়।

আতিকুর রহমান টিপু
সুগামো, জাপান

কে ন্ট

রাশিয়ার চিঠি

এখন আর সেই রাশিয়া নেই। আছে অস্ত্র আর মাফিয়া চক্রের তৎপরতা...

আজ থেকে ১৪ বছর আগে ১৮ বছর বয়সে স্কলারশিপ নিয়ে যখন রাশিয়াতে গিয়েছিলাম, সেই রাশিয়া আর আজকের রাশিয়ার সভ্যতা কৃষ্টি সামাজিক অর্থনৈতিক আর রাজনীতির যে কত বিশাল পার্থক্য ঘটেছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মত নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকেও এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখার উদ্দেশ্যে আসত। তখনকার রাশানদের আচার-আচরণ ব্যবহার, উদার মনোভাব, অতিথিপরায়ণতা, সংস্কৃতি প্রত্যেকটা দিকই ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। মাঝে মাঝে মতো হত এরা বুঝি দেবতা! বস্তুতপক্ষে এখানে এসেই অজানাকে জানা, জীবনকে সুন্দর পথে ধাবিত করতে শেখা, অভিজ্ঞতার আলোকপাত– অনেক কিছুই এখান থেকে নেয়া। তখন সবেমাত্র দেশ থেকে এসে প্রিপারেটরি কোর্স করছি। নবেম্বরের হাড় কাঁপানো শীত, সারা শহর বরফে ঢাকা। বাইরে তুষারপাত আর সকাল ৯টায় ক্লাসে যাওয়া। সে যে কি কষ্ট! একদিন সকালে এলার্মটি বাজেনি, হঠাৎ দরজায় শব্দ। খুলে দেখি দু'জন হোস্টেল অ্যাটেনডেন্স সহ আমার ম্যাডাম ৬০ বছর বয়স্কা সিভিৎলানা ইলিনিশনা। উনি ভেবেছিলেন আমি হয়ত অসুস্থ, খুব লজ্জা পেয়েছিলাম।

উনি মিষ্টি হেসে নিজের ছেলের মতো আমাকে কাপড় পরিয়ে হাত ধরে ক্লাসে নিয়ে গেলেন। ৫টায় সবার ছুটি। আমার ওপর নির্দেশ এল ৬.৩০ পর্যন্ত উনি আমাকে ক্লাস করাবেন। সেদিন ওনার ওপর ভীষণ রাগ হয়েছিল। আমার সেই শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম এখন আর জীবিত নেই। কিন্তু সে দিনের সেই চুল আঁচড়িয়ে দেয়া, ওভার কোটটি ভালোভাবে জড়িয়ে দেয়া, সেই হাসি আর ভালোবাসর কথা আমার মনের গভীরে চিরদিন থাকবে।

'৯৩তে লেখাপড়ার একটা পর্ব শেষ করে ইংল্যান্ড চলে যাওয়ার সময় মনে হয়েছিল যেন দ্বিতীয় মাতৃভূমি ছেড়ে যাচ্ছি। High Culture and Civilized Country ইংল্যান্ড হল আরেকটা জগৎ, তবে এটা সত্যি যে- সেই হৃদয়, সহানুভূতি আর ভালোবাসা এখানে অন্তত নেই।

দীর্ঘ ৯ বছর পরে ৩ দিনের ভ্রমণে আবার সেই রাশিয়াকে দেখতে গেলাম। কিন্তু এ কি দেখলাম? এ কোন ধরনের নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার হল? যে রাশিয়াকে স্থান দিয়েছিলাম দ্বিতীয় মাতৃভূমির, চলে যাওয়ার প্রাক্কালে যে দেশের জন্যে কেঁদেছিলাম, যে দেশের মানুষগুলোর কথা আজ অব্দি ভুলতে পারিনি সেই রাশিয়াই এখন পৃথিবীর অন্যতম মাফিয়ার জায়গা। সেই রাশানদের খারাপ অসভ্য ব্যবহারে বর্তমান স্টুডেন্টসহ ট্যুরিস্ট সবাই অতিষ্ঠ। হাইজ্যাকার, গুন্ডাদের ছড়াছড়ি রাস্তায়, দোকানে, ট্রেনে, ট্রামে, বাসে, মেট্রো সর্বত্র। দিনের আলোয় পিস্তল দিয়ে নিরীহ বিদেশীদের মাথা উড়িয়ে দিতে এদের এখন বিন্দুমাত্র হাত কাঁপে না। কোনো বিচার এখানে নেই। এটাই হয়ত রাশিয়াতে আমার শেষ যাওয়া। আমার পাশাপাশি প্রাক্তন বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরাও আরেকবার সেখানে ভ্রমণ করতে না যাক, এ ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার না হোক নিজের চোখে এ ধরনের জঘন্য অপরাধগুলো না দেখুক। হয়তো বা রাশিয়ার এ পরিস্থিতির একদিন অবসান ঘটবে। আবার হয়তো একটা পরিবর্তন আসবে। ফিরে আসবে আবার সেই রাশিয়া– যেখানে থাকবে সহানুভূতি ভালোবাসা আর সিভিৎলানার মতো টিচার। সংখ্যাটি কেউ পাঠালে কৃতজ্ঞ হবো।

Sanet, 139 Station Rd., Herne Bay
Kent, Ct6 5QA, England

দো হা

তোমাদের প্রশংসা

বাংলাদেশী চিকিৎসক দম্পতি মানব কল্যাণের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন

মানুষ তার কর্মের মাঝে বেঁচে থাকে। কর্মক্ষেত্রের সফলতা একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সম্মানের ব্যাপার। এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমাদের কিছু লোক তাদের মেধা, কর্মদক্ষতা দিয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করে চলেছেন। আমাদের রাজনীতিবিদরা যেখানে বিশ্বের বুকে দেশকে, দেশের মানুষকে অপমানিত করছেন। বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে নিজের দেশকে আখ্যায়িত করার পরও বিরামহীন মিথ্যার বেসাতি করে চলেছেন, সেখানে কিছু মেধাবী বাংলাদেশীর সৎকর্ম, কর্মদক্ষতা আমাদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। করেছে সম্মানিত। আজ সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের এমনই এক মেধাবী বাংলাদেশী দম্পতির কথা বলবো। কাতারের রাজপরিবার থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত যাদের চিনতো, সবাই তাদের ভালোবাসতো। এই সফল দম্পতি হলেন ডা. সিরাজ খাঁন এবং তার সহধর্মিনী ডা. লক্ষ্মী খান। ডা. সিরাজ খান ছিলেন কাতারের সর্ববৃহৎ হাসপাতাল হামাদ মেডিকেল হাসপাতালের নিউওরোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান। এবং তার স্ত্রী ডা. লক্ষ্মী খান একই হাসপাতালের গাইনি ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন। ২৫ বছর কাতারে সফলতার সঙ্গে নিজের কর্মজীবন সমাপ্ত করে ডা. সিরাজ এবং লক্ষ্মী দম্পতি গত কিছুদিন আগে লন্ডনের উদ্দেশে দোহা ত্যাগ করেছেন। এই সফল এবং সুখী দম্পতির একমাত্র কন্যা সন্তান লন্ডনেই লেখাপড়া করে। দিল্লি এবং লন্ডনে তাদের দু'টি বাড়ি আছে।

মানব কল্যাণে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এ দম্পতি

অবসরে এই দম্পতি ময়মনসিংহ জেলায় তার নিজ গ্রাম বারা গ্রামে এবং ভারতের ইন্দোর-এর 'দিওয়াস' এই দুটি এলাকায় সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

সাঈদুর রহমান কালাম
পোস্ট বক্স নং-৫৭০, দোহা-কাতার

মক্কা

কূটনৈতিক টানাপোড়ন

বিষয়টিকে আফগানিস্তানের তালেবানের বুদ্ধ মূর্তি ধ্বংসের সঙ্গে তুলনা করা হয়

এই প্রাসাদটি নিয়েই আরব ও তুরস্কের মধ্যে চলছে দ্বন্দ্ব

হজযাত্রীদের আবাসন তৈরির জন্য ওসমানীয়া শাসনামলের একটি পুরাতন দুর্গ ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত সৌদি আরবের জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিষয়, তা তুরস্কের সমস্যা নয়। সম্প্রতি সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বার্তা সংস্থা এপি'র কাছে এ মন্তব্য করেন। তুরস্ক সৌদি আরবের ঐ প্রাচীন দুর্গ ভেঙে ফেলার ঘটনাকে তালেবান কর্তৃপক্ষের বুদ্ধমূর্তি ভাঙার সঙ্গে তুলনা করেছিল।

১৯২৩ সালে আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠা হয়। পবিত্র মক্কা মহানগরীকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে যেসব প্রকল্প নেয়া হয়েছে তার একটি অংশ হল উসমানীয় আমলের এই দুর্গের স্থানে আবাসিক এলাকাসহ বিপণী বিতান নির্মাণ। সম্প্রতি এই দুর্গ ভাঙা নিয়ে সৌদি আরব ও তুরস্কের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়ন চলছে। মক্কা নগরীকে আধুনিক শহরে পরিণত করার জন্য যেসব বৃহৎ প্রকল্প নেয়া হয়েছে, এটি এর মধ্যে অন্যতম। সৌদি সরকারের পরিকল্পনাকারীরা কোটি কোটি ডলারের প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। দুর্গটি ভেঙে ফেলায় সম্প্রতি তুরস্কে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছে। পবিত্র মক্কা নগরীর পবিত্রতম হেরেম শরিফের চারপাশে বর্তমানে যে পরিমাণ হজযাত্রীর স্থান সংকুলান হয়, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দ্বিগুণেরও বেশি হজযাত্রীর স্থান সংকুলান হবে। মক্কায় মুসলিম সফরকারীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। কিন্তু পবিত্র হেরেম শরিফের কাছাকাছি এলাকায় অধিকাংশ ভবনই পুরাতন এবং সেগুলোর ধারণ ক্ষমতাও সীমিত, যার ফলে হেরেম শরিফের চারদিকে উঁচু আধুনিক ভবন নির্মাণ করে সমস্যার সমাধান করা হবে। পবিত্র মক্কা নগরীর এই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কয়েক বছর সময়ের প্রয়োজন হবে।

সৌদি কর্তৃপক্ষ হোটেল কমপ্লেক্সের জন্য মক্কায় আল-আয়াদ দুর্গপ্রাসাদ গুঁড়িয়ে দেয়ার পর তুরস্কের সংস্কৃতিমন্ত্রী ইসতেমিহান তালে অভিযোগ করেছেন যে, সৌদি আরব অটোমান সাংস্কৃতিক নিদর্শন ধ্বংসযজ্ঞে নেমেছে। তিনি আরও বলেন, আফগানিস্তানে তালেবানের বুদ্ধ মূর্তি ধ্বংস এবং অটোমান ঐতিহ্যের প্রতি সৌদি কর্তৃপক্ষের বৈরিতার মধ্যে একটা মিল রয়েছে। এটা মানবতার বিরুদ্ধে একটা অপরাধ। ইউনেস্কোর উচিত এই অবমাননাকর ও কুৎসিত বিনাশ ও সাংস্কৃতিক ধ্বংসযজ্ঞ সর্বত্র প্রকাশ করা।

জিয়াউদ্দিন মাহমুদ (হাজি মিঠু), Zia7zia@hotmail. Com

সুইডেন

জীবন প্রবাহ

জীবন এখানে অনেক কঠিন। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে প্রতিটি মুহূর্ত

সুইডেনে এসেছি ২৬ বছর। এখানে জীবন মানেই মেশিন। চলছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। সোম থেকে শুক্রবার প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজের উদ্দেশে রওনা দেওয়া। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। কারণ এখানে একজনের রোজগারে চলা যায় না। ৫ মিনিট লেইট হলে আধা ঘন্টার টাকা কাটা যাবে, তাই ৫ মিনিট আগে যাওয়াই ভালো। এখানের যাতায়াত ব্যবস্থা বাস এবং পাতাল ট্রেন। ঘরে ফিরে আসে সবাই ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে। কেউ বা আরো দেরিতে। আমরা কেউ বলি না অফিসে যাচ্ছি। সবাই বলি কাজে যাই। শনি এবং রবি এই দু'দিন সরকারি ছুটি, যেহেতু ৪০ ঘন্টা সপ্তাহে কাজ করতে হয়। এই দু'দিন আবার রুটিনবাঁধা নিয়ম। কাপড় ধোয়া, ঘর পরিষ্কার, বাজার করা ইত্যাদি ইত্যাদি কেউ। আসবে না হয় কেউ যাবে কারো বাসায়। এখানের একশ' ভাগ সৎ উপার্জন। আমরা যখন এখানে কেনাকাটা করি এবং ঘর ভাড়া দেই তখন ক্রোনোর (সুইডিশ মুদ্রা) দিয়েই কিনি। সব সংসারের খরচ এবং বিল দেওয়ার পর দেখা যায় হাতে তেমন কিছুই থাকে না। এরই মাঝে বুড়ো বাবা-মা, ছোট ভাই-বোন থাকলে পাঠাতে হয় কিছু ডলার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন বাংলাদেশে যাই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনরা মনে করে সুইডেনে হয়তো টাকার মেশিন আছে অথবা রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায় বিনা পরিশ্রমে। তাই তারা সমস্ত সমস্যাগুলো সামনে নিয়ে আসে। টাকা দাও টাকা দাও। গরিব-দুঃখিকে সাহায্য করা যায় কিন্তু যারা ভালো ও বড় পোস্টে আছে আবার উপরি উপার্জনও করে তারা কেন আসে বুঝি না। দেশে গেলে সবার জন্য কম-বেশি টুকিটাকি উপহার নিয়ে যাই কিন্তু তাদের এগুলো পছন্দ হয় না। বলে, কি এসব নিয়ে এসেছো? ক্রিস্টালের বড় জিনিস আনতে পার না? অথবা চেয়ে বসবে এমন একটা জিনিস যার দাম সুইডেনে ১০/১২ হাজার ক্রোনোর। যখন দেশ থেকে ফিরে আসি তারা কিন্তু কোনো উপহার পাঠায় না। প্লিজ আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিন অন্তত যখন ৪/৬ সপ্তাহরে জন্য বছরে একবার দেশে আসি।

নীরব স্বাক্ষর তীর্থ ও দীপাঙ্কর
সুইডেন

প্যা ।রি ।স

দেশের হালচাল

স্বাধীনতার ৩১ বছর পার হলেও কিছু বিষয় নিয়ে আজও বিতর্ক হয়। এসব বিতর্কের অবসান হওয়া প্রয়োজন

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের স্বাধীনতার ইতিহাস আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ইতিহাস। যে দিনের বদৌলতে বিশ্বের বুকে আমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। যে দিনটি এসেছিল বলেই আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছি। স্বাধীনতা যুদ্ধকে সংগঠিত করার জন্য প্রথমে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন যারা তারা অধিকাংশই ছিলেন আনসার, বিডিআর, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সদস্য। পাকিস্তানি হায়েনাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রথম অস্ত্র সংগ্রহও তাদেরই অবদান। স্বাধীনতার ঘোষকও ছিলেন (তখনকার সময়ের) নির্দলীয় একজন সামরিক অফিসার। আর সর্বাধিনায়ক হিসেবে যুদ্ধকে পরিচালনার দায়িত্বে যিনি ছিলেন, উনিও একজন নির্দলীয় সামরিক অফিসার। প্রথম সংগঠিত হওয়ার পর তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন দলমত নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসী।

স্বাধীনতার পর জনগণ চেয়েছিল একটি দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে। যেখানে থাকবে দেশবাসীর জান-মালের নিরাপত্তা এবং তাদের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা। স্বাধীনতার ৩২ বছর পর দেশের অবস্থা দেখলে মনে হয় এটা স্বাধীনতা নয়, এ যেন এক অপরাধীর স্বর্গরাজ্য। বিগত সরকারের আমলে প্রমাণিতও হয়েছে তাই। শুধু তাই নয়, নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পন্থায় প্রতারিত হচ্ছে দেশের অসহায় মানুষ। আমার মনে হয় কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ঘুষ একটি সামাজিক মারাত্মক ব্যাধি, যা থেকে সমাজের সব অপরাধের উৎপত্তি। অথচ তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ নেই। কিন্তু কেন? স্বাধীনতার পর ঘুষ আর গোপন কোনো ব্যাপার নয়। এর বিরুদ্ধে দেশে প্রচলিত আইন থাকলেও তা প্রয়োগের ব্যবস্থা নেই। এটা সবার কাছে পছন্দনীয় বলেই হয়তো প্রতিবাদ নেই।

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের রাজনীতি একটা লাভজনক পেশা হিসেবে দেখা দিয়েছে। নিঃস্বার্থ রাজনীতিবিদ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। ব্যতিক্রম ২-১ জন ছাড়া প্রতিটি জনপ্রতিনিধি নির্বাচন এলে পুঁজি বিনিয়োগ করে লাভের জন্য। নির্বাচনের পর গড়ে তোলে সম্পদের পাহাড়। প্রতিবাদের কেউ নেই। কারণ দেশ ও জাতি তাদের হাতেরই খেলার পুতুল। যে কারণে দেশের প্রতিটি শহরে অসহায় জনগণের রক্ত শোষণ করে গড়ে উঠেছে গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, বারিধারার মতো অভিজাত এলাকা। আর সেই সুযোগে পাকিস্তানের ২২ পরিবারের পরিবর্তে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে হাজারো পরিবার। শোষণের মাত্রাও বেড়ে গেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি।

Mohamed Abdul Barek Farazi, 5, Place Roger Salengro, 95140, Garges Les Gonesse, Paris-France

সি ।ঙ্গা ।পু ।র

এ কোন বাস্তবতা

এটা বাংলাদেশ নয়, ঘুষের কথা চিন্তাও করা যায় না সিঙ্গাপুরে

বাংলাদেশে থেকে সিঙ্গাপুর সম্বন্ধে কোনো রকম ধারণাই করা যায় না। 'ইত্যাদি'র বদৌলতে হয়তো জুরং বার্ড পার্ক-এর কিয়দংশ বা 'লাভ ইন সিঙ্গাপুর' সিনেমায় হয়তো Sentosa'র কিছু টুরিস্ট স্পট অনেকে দেখেছেন। কিন্তু বাস্তবের সিঙ্গাপুর আরো মনোমুগ্ধকর, আরো আকর্ষণীয়। সিঙ্গাপুরের যেখানেই গিয়েছি আমার কাছে খারাপ লাগেনি। তবে মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয়েছে এরা পাশ্চাত্য সভ্যতাটাকেই রপ্ত করতে চাইছে।

লি-কুয়ান-ইউ নামে এক ভদ্রলোক রিপাবলিক অব সিঙ্গাপুরের সিনিয়র মন্ত্রী। তার সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত। তবু একটু শুনেছি, তার মহতী উদ্যোগ, প্রচেষ্টা আর নিষ্ঠার ফলেই সিঙ্গাপুর আজ পৃথিবীর প্রথম সারির একটি দেশ। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আমাদের দেশে একজন লি-কুয়ান-ইউ-এর মতো নেতার অভাব। গত সেপ্টেম্বর মাসে একটা জিডি করার জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানায় গিয়েছিলাম। জিডি করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু উৎকোচ দিতে হয়েছিলো দুইশ টাকা। দায়িত্বরত কর্মকর্তা বলেন, এটা ওনাদের প্রাপ্য। আর সিঙ্গাপুরে এমনটা কল্পনা করাও অন্যায়। ধিক, শত ধিক বাংলাদেশ পুলিশের ঐ মানসিকতাকে। মাঝে মাঝে খুবই করুণা করতে ইচ্ছে হয় প্রশাসনের চেয়ারগুলোতে বসে থাকা জনগণের ঐসব গোলামদের।

Liaquat Ali, Yard No-17728-C-22, Sembawang Shipyard, 60, Admiralty Road, West. Republic of Singapore

টো ।কি ।ও

গিনেস বুক অব রেকর্ডস

কামাতো হোংগো এখন বিশ্বের বয়স্কতম মানবী

কামাতো হোংগো

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১৫ মার্চ সংখ্যার 'প্রবাস জীবন' বিভাগে বিশ্বের বয়স্কতম পুরুষ ১১৩ বছর বয়স্ক এন্টানিও টোডে-র মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় বিশ্বের দীর্ঘজীবী মানব হিসেবে আমেরিকান ১১৪ বছরের মহিলা মাউদে ফারিসলুস-এর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। মাউদে সম্প্রতি ১১৫ বছর ৫৬ দিন বয়সে মৃত্যুবরণ করলে ১১৪ বছরের জাপানি মহিলা 'কামাতো হোংগো (Kamato Hongo) এখন বিশ্বের বয়স্কতম মানব হিসেবে গিনেস বুক অব রেকর্ডস-এ স্থান করে নিয়েছেন। হোংগো সান ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ সালে কাগোশিমা জেলার ইসেনচো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরেই জন্মেছিলেন ১৮৮৬ সালে সে সময়কার শীর্ষ বয়স্ক শিগেচিও ইজুমি (Shigechiyo Izumi) যিনি ১২০ বছর ২৩৭ দিন বেঁচে ছিলেন। বয়সের কারণে হোংগো সান ভালোমতো কথা বলতে পারেন না। তবে তার স্বাস্থ্য চমৎকার, খেতে পারেন সবকিছু। মেয়ে ৭৮ বছরের সিজুই কুরাউসি (Shizue Kurauchi) তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। দীর্ঘ জীবনের শীর্ষ দেশ জাপান। পুরুষদের গড় আয়ু ৭৭.৭২ বছর, মহিলাদের ৮৪.৬০ বছর। প্রতি ২০ জন মহিলার একজন তাদের ১০০তম জন্মদিন পালন করতে পারেন।

ইয়াজদান হক ইনান, টোকিও, Yazdam enan@ docomo.ne.Jp